নির্বাচনী আইন সংস্কার: আমরা কোথায়?

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (১৪ নভেম্বর, ২০১৩)

আমাদের সংবিধানের ১২৩(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সংসদের মেয়াদের শেষ ৯০ দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা। নবম জাতীয় সংসদের মেয়াদ শেষ হবে ২৪ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে। তাই দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নির্বাচনকালীন সময় বা 'নির্বাচনী সাইকেল' শুরু হয়ে গিয়েছে এবং ২৭ অক্টোবর ২০১৩ থেকে ২৪ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখের মধ্যে যে কোনো দিন নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নির্বাচন কমিশনের থাকার কথা।

সঠিকভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য কমিশনের অনেকগুলো টেকনিক্যাল বা কারিগরি প্রস্তুতির প্রয়োজন। একটি যথাযথ আইনি কাঠামো প্রণয়ন, একটি নির্ভরযোগ্য ভোটার তালিকা তৈরি, নিরপেক্ষতার সঙ্গে নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণ ইত্যাদি এ কারিগরি প্রস্তুতির অন্যতম। ইতোমধ্যে সংসদ *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২ (আরপিও) সংশোধনের লক্ষ্যে একটি বিল পাশ করেছে। কমিশন নির্বাচনী আচনরণবিধিও চূড়ান্ত করেছে। আজকের সংবাদ সম্মেলনের উদ্দেশ্যে হলো আইনি কাঠামো প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা কোথায় আছি তা নিরূপণ করা।

১

অনেকেরই স্মরণ আছে যে, ড. শামসুল হুদা, বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম. সাখাওয়াত হোসেন ও জনাব ছহুল হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত গত নির্বাচন কমিশন তাদের বিদায়ের আগে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে আইনি কাঠামো প্রণয়নের ক্ষেত্রে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিল। এ পদক্ষেপগুলোর অন্যতম ছিল কয়েকটি আইনের খসড়া প্রণয়ন। যেমন, 'প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার (নিয়োগ পদ্ধতি) আইন', 'নির্বাচনী প্রচারণা ব্যয় (জন তহবিল) আইন', 'নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ বিধিমালা', 'ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন প্রচলন'। এছাড়াও আরপিও সংশোধনের লক্ষ্যে গত নির্বাচন কমিশন কতগুলো সুপারিশ আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। আমরা শুনেছি যে, গত কমিশনের বিদায়ের পর আইন মন্ত্রণালয় তাদের প্রস্তাবগুলো কমিশনে ফেরত পাঠায়।

২

জনাব কাজী রকিব উদ্দিনের নেতৃত্বে পুনর্গঠিত নির্বাচন কমিশন আরপিও সংশোধনের লক্ষ্যে কতগুলো প্রস্তাব বিল আকারে ২৫ জুলাই ২০১৩ তারিখে আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। শোনা যায় যে, কমিশন এর আগেও তিনবার আইন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করে যা মন্ত্রণালয় ফেরত পাঠায়। সর্বশেষ প্রস্তাবিত খসড়ায় কমিশন আরপিও'র ৪১টি ধারায় ছোট বড় পরিবর্তনের প্রস্তাব আনে। এর মধ্যে সাতটি প্রস্তাব আমরা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। যেগুলো হলো: (১) নির্বাচনী ব্যয়সীমা ১৫ লাখ থেকে ২৫ লাখ টাকায় এবং মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার জামানত দশ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকায় বৃদ্ধি; (২) কমিশনকে নির্বাচনী ব্যয় নিরীক্ষণের ক্ষমতা প্রদান; (৩) নির্বাচনী অপরাধের জন্য দণ্ডের বিধানে পরিবর্তন; (৪) স্বতন্ত্র-বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ার ওপর বাধা-নিষেধ আরোপ; (৫) প্রাসঙ্গিক কোন তথ্য গোপন বা আরপিও'র যে কোনো বিধান আমান্য করার জন্য নির্বাচনী বিরোধের দরখাস্ত করার এখতিয়ার প্রদান; (৬) দেশের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে গিয়ে দলীয় প্রধানের যে ব্যয় হবে তা নির্বাচনী ব্যয় হিসেবে গণ্য না করা; (৭) দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে নির্দিষ্ট সংখ্যক কমিটি ও দফতর না থাকলে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিল করা।

দলের মনোনয়ন বঞ্চিত হয়ে কোন ব্যক্তি স্বতন্ত্র প্রার্থী হলে তাকে বিদ্রোহী প্রার্থী বলা হয়। বিদ্যমান আইনেও বিদ্রোহী প্রার্থীর ওপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তবে বর্তমান কমিশনের প্রস্তাবিত আইনে এই নিয়ন্ত্রণ আরও পাকাপোক্ত করা হয়েছে। কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশোধনীতে নিবন্ধিত দলের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মনোনয়নপত্র জমা ও প্রত্যাহারের এখতিয়ার দলকে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও দল কর্তৃক প্রাথমিকভাবে মনোনীত এবং দলের মনোনয়নপত্র নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া প্রার্থীদের কেউই বিদ্রোহী প্রার্থী হতে পারবেন না, এমনকি সাবেক এমপিরাও নন। কারণ দলের পক্ষ থেকে দলের মনোনীত চূড়ান্ত প্রার্থীর নাম রির্টানিং অফিসারের কাছে পাঠালে, দলের প্রাথমিকভাবে মনোনীত অন্য সব প্রার্থীর মনোনয়ন আপনা থেকেই প্রত্যাহার হয়ে যাবে। প্রসঙ্গত, আরপিও'র বিধান অনুযায়ী, স্বতন্ত্র প্রার্থীদেরকে তাদের মনোনয়নপত্রের সঙ্গে এক শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর সম্বলিত তালিকা সংযুক্ত করতে হয়, সাবেক সংসদ সদস্যদের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য নয়।

পরবর্তীতে গত ২৮ জুলাই নির্বাচন কমিশন আরপিও'র ধারা-৯১ই বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়। ৯১ই ধারায় গুরুতর অসদাচারণের অভিযোগে, তদন্ত সাপেক্ষে, প্রার্থীতা বাতিলের ক্ষমতা কমিশনকে দেওয়া হয়েছে। কমিশনের এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠে, যার ফলে কমিশন নিজের ক্ষমতা খর্ব করার এ আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়।

৩

কমিশনের প্রস্তাবগুলো যাচাই-বাছাই করে কিছু পরিবর্তন-পরিবর্ধনসহ আইন মন্ত্রণালয় একটি খসড়া বিল ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ মন্ত্রিসভায় প্রেরণ করে। আইন মন্ত্রণালয় কমিশন কর্তৃক প্রেরিত আরপিও'র খসড়ায় ২৮টি ধারায় ছোট-বড় পরিবর্তনের প্রস্তাব করে।

আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদে প্রেরিত প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো: (১) সাজাপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধীদের ভোটার হওয়ার যোগ্যতা রহিতকরণ; (২) নির্বাচনে ব্যয়সীমা ১৫ লাখ টাকা থেকে ২৫ লাখ টাকায় এবং মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার জামানত দশ হাজার

থেকে ২০ হাজার টাকায় বৃদ্ধি; (৩) প্রস্তাবিত সংশোধনীতে অনেকগুলো নির্বাচনী বিধি-বিধান ভঙ্গের জন্য শাস্তির পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অভিযোগ নিষ্পন্ন করা যাবে; (৪) স্বতন্ত্র প্রার্থী সম্পর্কে পরিবর্তন অর্থাৎ কোনো দলের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত প্রার্থীর নাম রিটানিং অফিসারের কাছে জমা দেওয়া হলে, অন্য সব প্রার্থীর, যারা দলের প্রাথমিকভাবে মনোনীত প্রার্থী হিসেবে দলের প্রত্যয়নপত্রসহ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন, তাদের মনোনয়নপত্র আপনা থেকেই প্রত্যাহার হয়েছে বলে গণ্য হবে; (৫) দেশের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে গিয়ে দলীয় প্রধানের যে ব্যয় হবে তা নির্বাচনী ব্যয় হিসেবে গণ্য না করা; (৭) দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে নির্দিষ্ট সংখ্যক কমিটি ও দফতর না থাকলে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিল করা হবে।

প্রসঙ্গত, কমিশনের প্রেরিত সিল মারার সঙ্গে সঙ্গে ব্যালট পেপারে 'মার্কিং' করে ভোট দান করার কমিশনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয় গ্রহণ করেনি।

কমিশনের আরও দু'টি প্রস্তাবও আইন মন্ত্রণালয় গ্রহণ করেনি, যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে পারতো। প্রথমত, কমিশন নির্বাচনী ব্যয় মনিটরিং-এর প্রস্তাব করেছিল [ধারা ৪৪খ(৬)], যা মন্ত্রণালয় গ্রহণ করেনি। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নির্বাচনে টাকার খেলা আজ আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য সর্বাধিক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ টাকার প্রভাবেই এখন আমাদের জাতীয় সংসদ ব্যবসায়ীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে এবং আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যরবস্থা তার 'প্রতিনিধিশীলতা'র চরিত্র হারিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, প্রাসঙ্গিক কোনো তথ্য হলফনামায় গোপন বা আরপিও'র যে কোনো বিধান অমান্য করার অভিযোগে নির্বাচনী বিরোধের দরখাস্ত করা যাবে – এমন বিধান আরপিও'তে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব কমিশনের ২৫ জুলাই আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত বিলে ছিল [ধারা-৫১(১)(খ)]। কিন্তু মন্ত্রণালয় এটিও গ্রহণ করেনি। এখন প্রশ্ন হলো: এর ফলে কি এগুলো আর নির্বাচনী অপরাধ বলে গণ্য হবে না? এগুলোর বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নির্বাচনী ট্রাইবুনালের আশ্রয় নিতে পারবে না? তা যদি না করা যায়, তাহলে বিরাজমান 'কালচার অব ইম্পিউনিটি' বা অপরাধ করে পার পেয়ে যাওয়ার সংস্কৃতি অব্যাহত থাকবে।

৪

গত ২৮ অক্টোবর জাতীয় সংসদে আরপিও বিল পাস হয়। পাশ করা বিলে আইন মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত যেসব বিধান রাখা হয়েছে তা হলো: (১) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে সাজাপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অযোগ্য ঘোষণা; (২) নির্বাচনী ব্যয়সীমা ১৫ লাখ থেকে ২৫ লাখ টাকায় এবং মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জামানত বর্তমানে দশ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকায় বৃদ্ধি; (৩) বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ; (৪) দেশের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে গিয়ে দলীয় প্রধানের যে ব্যয় হবে তা নির্বাচনী ব্যয় হিসেবে গণ্য না করা; (৫) দেশের বিভিন্ন প্রশাসনিক স্তরে নির্দিষ্ট সংখ্যক কমিটি ও দফতর না থাকলে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিল করা ইত্যাদি।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে এ ধরনের বিধি-নিষেধ দলীয় মনোনয়ন প্রদানে দলীয় প্রধানদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তারা যে কোনো বসন্তের কোকিলদের মনোনয়ন প্রদান করতে পারবেন। ফলে মনোনয়ন বাণিজ্য ও নির্বাচনে টাকার খেলার আরও বিস্তার ঘটবে।

সংসদে পাশ করা বিলে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে, যা নির্বাচন কমিশন কিংবা আইন মন্ত্রণালয় কেউ প্রস্তাব করেনি। ২০০৯ সালে জাতীয় সংসদে অনুমোদিত আরপিও'তে নিবন্ধিত দলের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের তিন বছরের জন্য দলের সদস্য থাকার বিধান ছিল। কিন্তু সম্প্রতি সংসদে পাশ হওয়া বিলের মাধ্যমে আরপিও'র এ বিধান রহিত করা হয়। আমরা জানি না, কি উদ্দেশ্যে কিংবা কাদের স্বার্থে এ জনবিরোধী বিধানটি রহিত করা হয়েছে। তবে এটি দল ভাঙ্গার হীণ উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে বলে অনেকের ধারণা।

আরপিও নির্বাচন কমিশনের আইন এবং কমিশনেরই সাংবিধানিক দায়িত্ব সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা। কিন্তু আইন ও বিচার বিভাগ সম্পর্কীত সংসদীয় কমিটি – যে কমিটি এ বিধানটি রহিত করার প্রস্তাব করেছে – তাদের সুপারিশ প্রেরণের আগে কমিশনের মতামত গ্রহণেরও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি এবং সংসদও এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন তোলেনি। (নির্বাচন কমিশনের মতামত ছাড়াই সংসদেরও অবশ্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে।) দুর্ভাগ্যবশত কমিশনও এ ব্যাপারে কোনোরূপ উচ্চ-বাচ্য করেনি।

প্রসঙ্গত, বর্তমান সংসদ অতীতেও এ ধরনের জনবিরোধী কার্যক্রমে লিপ্ত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৮ সালে প্রণীত আরপিও'র অধ্যাদেশে সংসদ নির্বাচনে নিবন্ধিত দলের মনোনয়ন নির্ধারণের জন্য দলের স্থানীয় নেতাকর্মীদের তৈরি প্যানেলের ভিত্তিতে মনোনয়ন প্রদানের বাধ্যবাধকতা ছিল। কিন্তু নবম সংসদ কর্তৃক অধ্যাদেশটি অনুমোদনকালে এতে পরিবর্তন এনে প্যানেলটি শুধুমাত্র বিবেচনায় নিয়ে দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার বিধান করা হয়। ফলে দলের মনোনয়ন বোর্ড তথা দলীয় প্রধানগণ মনোনয়ন দেওয়ার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা আবারও ফিরে পান এবং এ প্রক্রিয়ায় দলের তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা ক্ষমতাহীন হন।

গতকাল চুড়ান্ত করা আচরণবিধিতে নির্বাচন কমিশন কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে, 'নির্বাচন-পূর্ব সময়'-এর সংজ্ঞা ও 'প্রচারণার সময়কাল'-এর বিধান রহিতকরণ যার অন্যতম। পাঁচ বছর আগে 'সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮' প্রণীত হয়, যা গেজেটের মাধ্যমে এখনো বহাল আছে। বিদ্যমান এ আচরণবিধি অনুযায়ী, 'নির্বাচন-পূর্ব সময়' বলতে 'সাধারণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে, সংসদের মেয়াদ উত্তীর্ণ কিংবা সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর হইতে পরবর্তী সংসদ নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কাল'কে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রণীত আচরণবিধির সংজ্ঞা অনুযায়ী 'নির্বাচন-পূর্ব সময়' এর পরিমাণ ৯০ দিন।

গতকাল চুড়ান্ত করা আচরণবিধি অনুযায়ী, 'নির্বাচন-পূর্ব সময়' বলতে 'জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন কিংবা কোনো আসনে উপনির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার দিন হইতে সরকারি গেজেটে প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত সময়কাল'কে বোঝানো হয়েছে। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী 'নির্বাচন-পূর্ব সময়' এর পরিমাণ আনুমানিক ৪৫ দিন।

এটি সুস্পষ্ট যে, বিদ্যমান আচরণবিধির তুলনায় চুড়ান্ত করা আচরণবিধিতে 'নির্বাচন-পূর্ব সময়' এর পরিমাণ অর্ধেকে কমিয়ে আনা হয়েছে। এটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এ সময়ে 'ইভেন প্লেয়িং ফিল্ড' বা নির্বাচনী মাঠের সমতলতা নিশ্চিত করার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা কমিশনের। অর্থাৎ এ সময়ে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের পরিপূর্ণ এখতিয়ার কমিশনের। তাই চুড়ান্ত করা আচরণবিধিতে নির্বাচন পূর্ব সময়ের পরিমাণ প্রায় অর্ধেকে কমিয়ে এনে কমিশন কোনো অজ্ঞাত কারণে নিজের ক্ষমতাই খর্ব করেছে। এ যেন অতীতের নিজেদেরকে ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করার প্রচেষ্টারই ধারাবাহিকতা!

কমিশন যে তার নিজের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য বদ্ধপরিকর তা আরেকভাবেও দেখা যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে আমাাদের সংবিধানের ১২৩(৩) ধারা মোতাবেক সংসদের মেয়াদের শেষ ৯০ দিন নির্বাচনকালীন সময়, যা আচরণবিধির 'নির্বাচন-পূর্ব সময়ের' সমতুল্য। সংবিধান নির্দেশিত নির্বাচনকালীন সময়ে কমিশন রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার কথা। সংবিধান কমিশনকে এ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ৯০ দিনের জন্য দিলেও, আচরণবিধির মাধ্যমে কমিশন তা প্রায় অর্ধেকে নামিয়ে এনছে, যার কারণ আমাদের কাছে বোধগম্য নয়।

এদিকে গত ২৭ অক্টোবর থেকে নির্বাচনকালীন সময়ের সূচনা হলেও, ক্ষমতাসীন দল বিনা দ্বিধায় নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরকারি ব্যয়ে ও অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে যাচ্ছেন, বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করছেন এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। একইসঙ্গে জনসভা করে নিজ দলের পক্ষে ভোট চাচ্ছেন। নিঃসন্দেহে এ সকল কর্মকাণ্ড আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের ওপর প্রভাব ফেলবে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন বলছে সরকার প্রধান ও সরকারি দলের এ ধরনের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তাদের নেই। এ প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে – কমিশন তাদের নিজের ক্ষমতাহীণতার বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্যই কি আচরণবিধিতে নির্বাচন পূর্ব সময়ের সংজ্ঞায় পরিবর্তন এনেছে? প্রসঙ্গত, ১৯৭৫ সালে ভারতের এলাহাবাদ হাইকোর্ট *রাজ নারায়ণ বনাম ইন্দিরা নেহরু গান্ধী* মামলায় সরকারি কর্মকর্তা ও সরকারি সুযোগ-সুবিধা ব্যবহারের জন্য ইন্দিরা গান্ধীর লোকসভার সদস্যপদ খারিজ করে দেন।

আমাদের নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। নাগরিকের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা কমিশনের দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে কমিশনকে সংবিধানে অগাধ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আলতাফ হোসেন বনাম আবুল কাসেম মামলায় (ডিএল আর ৪৫) সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ রায় দেন যে, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে কমিশন আইনি বিধানের সঙ্গে সংযোজনও করতে পারে। তাই কমিশন ক্ষমতাহীণ এ দাবী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং আমরা নাগিরক হিসেবে কমিশনের এ দাবীতে অসহায়ত্ব বোধ করি।

বিদ্যমান আচরিণবিধির ১২ ধারায় (যা এখনো বলবৎ আছে) নির্বাচনী 'প্রচারণার সময়' নির্ধারণ করে দেওয়া আছে। এ ধারা অনুযায়ী, 'কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচার শুরু করিতে পারিবে না'। এ বিধানের এবং গত কমিশনের এ বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনমনীয়তার ফলে গত জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার ও উপনির্বাচনগুলোতে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আচরণে অনেক পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছে। বস্তুত আমাদের নির্বাচনী অঙ্গণ থেকে সহিংসতা বলতে গেলে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বর্তমান কমিশন এ বিধান প্রয়োগে পরিপূর্ণভাবে অনীহা প্রদর্শন করেছে এবং করছে, যার ফলে ক্ষমতাসীন দল বিনা বাধায় নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কমিশনের অনাগ্রহ এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রচার-প্রচারণা নির্বাচনী অঙ্গণে একটি অসমতল ক্ষেত্র তৈরি করছে। লক্ষণীয় যে, শুধু প্রয়োগে অনীহা প্রদর্শন করেই কমিশন ক্ষ্যান্ত হয়নি, চুড়ান্ত আচরণবিধি থেকে এ বিধানটি বিলোপ করা হয়েছে।

এটি সুস্পষ্ট যে, নির্বাচন কমিশনের অগাধ ক্ষমতা থাকলেও, কমিশন যেন তা প্রয়োগে অনিচ্ছুক বা অপরাগ। গত কয়েকটি সিটি করপোরেশন নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অনেক ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু কমিশন কারও বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিয়েছে বলে আমরা শুনিনি। বর্তমানেও কমিশন ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাই আমরা মনে করি যে, নির্বাচন কমিশনের এ আচরণ আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু করার ক্ষেত্রে একটি বিরাট বাধা।